‘গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন সবার সঙ্গে সবাইকে সংযুক্ত করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে’

–খান মাহবুব

শ্রুতি লেখক: সাদিয়া ইসলাম শান্তা

[১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা সময়ে ৩ মে নানাবাড়ি টাঙ্গাইলের করাতিপাড়ায় প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং শিক্ষক খান মাহবুবের জন্ম। স্বাধীনচেতা ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী খান মাহবুব কিশোর বয়স থেকেই টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি অঙ্গনের পরিচিত মুখ। বিতর্ক, কবিতা, বক্তৃতায় রয়েছে অসংখ্য পুরস্কারের স্বীকৃতি। তিনি টাঙ্গাইল শহরের সরকারি বিন্দুবাসিনী স্কুল থেকে এসএসসি ও সরকারি এম এম আলী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কলেজ পর্যায়ে বিতর্কে অর্জন করেছেন জাতীয় পুরস্কার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে অর্থনীতির প্রতিবেদন ও ফিচার লিখে জাতীয় পত্রিকায় পরিচিতি অর্জন করেন। নিজেকে যুক্ত করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতার একজন সংগঠক হিসেবে। তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন পলল প্রকাশনী ও ছোঁয়া এ্যাড. নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

খান মাহবুব দেশের প্রকাশনা শিল্পের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বহুমাত্রিক লেখালেখি থাকলেও তিনি প্রকাশনা ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক লেখালেখিতে অধিক আগ্রহী। ‘এসময়ের অর্থনীতি’ খান মাহবুবের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। রচিত গ্রন্থ–‘বইমেলা ও বই সংস্কৃতি’, ‘বই’, ‘বইমেলা ও প্রকাশনার কথকতা’, ‘গ্রন্থচিন্তন’, ‘টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি’, ‘টাঙ্গাইলের অজানা ইতিহাস’, ‘আটিয়ার ইতিহাস’, ‘জানা-অজানা মালয়েশিয়া’, ‘পথে দেখা বাংলাদেশ’ ও ‘রোহিঙ্গানামা’ ইত্যাদি পাঠকমহলে সমাদৃত।

প্রকাশনা জগতে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠক। বই, বই প্রকাশনা ও বইমেলা সংক্রান্ত জাতীয় আয়োজনের বিভিন্ন দায়ি'ত্ব কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে খান মাহবুবের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ চালুর ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ ভূমিকা। বর্তমানে বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। লেখকদের সংগঠন ‘লেখক সম্প্রীতি’র মহাসচিব তিনি। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালিত সাংস্কৃতিক সমীক্ষার টাঙ্গাইল জেলার গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালার ‘প্রবাদ-প্রবচন’ গ্রন্থে রয়েছে খান মাহবুবের সংগৃহীত টাঙ্গাইল জেলার প্রবাদমালা। সম্প্রতি খান মাহবুবের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে ‘টাঙ্গাইল জেলার স্থাননাম বিচিত্রা’। শিল্পমনা খান মাহবুব বাংলা একাডেমি, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের

সদস্য।]

সম্প্রতি পাঠাগার আন্দোলন, বই ও প্রকাশনার নানা বিষয় নিয়ে সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক **লাবণী মণ্ডলের** সঙ্গে কথোপকথনে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন খান মাহবুব। নিচে সে-কথোপকথন প্রকাশ করা হলো।

লাবণী মণ্ডল: 'পাঠাগার' শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
খান মাহবুব: শাব্দিক অর্থ তো এর ভেতরেই নিহিত। পাঠের 'আগার' হচ্ছে পাঠাগার। যেখানে পাঠের ব্যবস্থা থাকে। আমরা যেটিকে লাইব্রেরি বলি, পাঠাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ। পাঠাগারের রকমফেরও আছে। এখনো পাঠাগারের যে সংস্কৃতি আছে, সেটি হচ্ছে–পাঠাগারে একটা বিশাল বইয়ের সমারোহ থাকে। তবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে এ ধারা বদলে যাচ্ছে। এখন আর এত টাকা, এত জায়গাজুড়ে পাঠাগার হবে না। এখন পাঠাগার হবে অনেকটা এমন–লক্ষ লক্ষ বইয়ের দরকার নেই। বইগুলো আসলে ডিভাইসে চলে আসবে। দুইজন লোক থাকবে, তারা ডিভাইস নিয়ে বসে থাকবে–সার্ভারে কানেক্ট করে দেবে আপনাকে। সেখান থেকে সব বই পড়ার সুযোগ থাকবে। যা-ই হোক, এখনো গতানুগতিক ধারার পাঠাগার থাকছে। তবে এসব পাঠাগারের গতানুগতিক ক্যাটালগ ও ইনডেক্সিং সিস্টেম কিন্তু উঠে গেছে বলা যায়।

লাবণী মণ্ডল: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং সৃজনশীল মানুষ গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা কতটুকু?
খান মাহবুব: যে-কোনো জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণে পাঠাগার খুব দরকার। মানুষের দুই ধরনের ডেভলপমেন্ট আছে–একটি ভিজিবল, আরেকটি ইনভিজিবল, যেটাকে আমরা বেশি গুরত্ব দিই না। যেমন–এই যে মানুষের মনোজাগতিক যেসব বিষয় আছে–মনের গঠন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যটা হয় তাঁর আচরণ, রুচির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এর জন্য কিন্তু পাঠাগারটা দরকার এবং এটাকে বলা হয়–গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অস্ত্রাগার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, আরও অনেক কিছু বলা হয়। পাঠাগার সম্পর্কে বই-পুস্তকে অনেক স্তুতিবাক্য আছে–পাঠাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। এ রকম অনেক স্তুতির কথা বলতে পারি।

পাশ্চাত্য উল্লেখ করে আমরা যাদের কথা বলি, তারা রুচিতে, মননে কতটা উৎকর্ষ। আমরা যত যা-ই বলি না কেন, আমাদের পূর্ববঙ্গে যে-জাগরণের কথা আমরা বলি, সেটা কিন্তু হয়েছে অনেকের মাধ্যমে। আরবরা এসেছে, তার আগে সনাতনরা ছিল; পাল, মুঘল ছিল; কিন্তু রেনেসাঁসটা আসলে ঘটেছে উপনিবেশিক আমলে। উপনিবেশ যে অনেক খারাপ, এ নিয়ে অনেক কিছু বলা সম্ভব। ইউরোপীয় সংস্কৃতিকেই আমরা আধুনিকতা বলি, সেইটা কিন্তু ইউরোপ থেকে এসেছে। তারা কিন্তু একটা ঋদ্ধ জনপদ ছিল এবং ঋদ্ধতার একটা মূল কারণ

ছিল– তারা কেবল ম্যানুয়াল ফিডে আগায়নি; পাঠাগার আন্দোলনের মতো বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং শিল্পের উৎকর্ষতার সঙ্গে যান্ত্রিক উৎকর্ষতার মিশ্রণে তারা ঋদ্ধ হয়েছে। ইউরোপে যে দুই ধরনের উৎকর্ষতা হয়েছে, তার একটি হলো শিল্পবিপ্লব, আরেকটি হলো সামাজিক বিপ্লব বা রেনেসাঁস। এর জন্য কিন্তু পাঠাগারটা খুব দরকার। একটা সময় ইউরোপে যখন পাঠাগার করা হলো, দেখবেন সেসব জায়গায় অনেক তুষারপাত হয়। সেখানকার জীবনটা কিন্তু আমাদের লো-ল্যান্ডের মতো না। মানুষ খুব জড়থবু হয়ে থাকে। ইউরোপের পাঠাগারগুলোর ছাদ প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে একটা আর্দ্রতার ব্যাপার আছে এবং মানুষ রাস্তাঘাটের দিকে না যেয়ে পাঠাগারের দিকে এল। ঝড়ের সময়ে আশ্রয়ণ এবং একটু একটু করে মানুষকে আকৃষ্ট করে পাঠক করার জন্য তারা বই-পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় করালো। যা-ই হোক আমাদের এই পাঠাগার কিন্তু ইউরোপের সেই রেনেসাঁসেরই উত্তরসূরী।

ইংল্যান্ডে যখন গণগ্রন্থাগার আইন হলো ১৮৫০ সালে, তারপর থেকেই কিন্তু এইখানে পাঠাগার আন্দোলনটা হলো এবং এখানকার এলিট শ্রেণীটা কিন্তু বুঝতে পারল যে, এখানে যদি আমরা ব্যবসাও করতে চাই–টিকে থাকার মতো একটা শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ দরকার। উপদেশ কিন্তু তাদেরই দেশ, তাদেরই শাসন; এলাকার জনগণকে তো খালি শোষণ করলে হবে না, ন্যূনতম একটা শান্তি তো বজায় রাখতে হবে। এজন্যই নাগরিকত্ব সুবিধার জন্য পঞ্চাশের পরে চুয়ান্ন সালে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ঢাকায় ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি, এ রকম ১২ থেকে ১৪টা লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। এগুলো শতবর্ষী লাইব্রেরি।

আমাদের দেশের পাঠচিত্রে এই লাইব্রেরি আরও বেশি দরকার। মানুষের প্রথম চাহিদাটা হলো জৈবিক চাহিদা। এরপর ধীরে ধীরে তার চাহিদা উচ্চমার্গের দিকে যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতির সেই উচ্চপর্বে যেতে কিন্তু আমাদের পাঠাগার লাগবেই। বই-পুস্তকের মাধ্যমে আর কিছু না হোক, একটা মানুষ তো হাজার মানুষ হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পায়। অনেকের সঙ্গে যোগসূত্র হয়, মানুষের গণ্ডিটা বড় হয়ে যায়। মানুষের রুচি-সংস্কৃতির একটা পরিবর্তন হয়। এই যে আমরা যান্ত্রিকভাবে যে-উন্নয়নের কথা বলি–ইট-বালু-সিমেন্টের অবকাঠামো বুঝি। এইগুলো কিন্তু পরের বিষয়। মানুষের যে ভেদিমূল, তাঁর চিন্তা-সংস্কৃতি, এর উন্নয়নের জন্য আপনার পাঠাগার দরকার। মানুষকে তো থামতে জানতে হবে, না হলে এই যে মানুষের অস্থিরতা, নৈরাজ্য, মানুষের ধনসম্পদ দখল করা। এই যে সামাজিক স্থিতির কথা বলি, মানবিকবোধ-ধর্মের দোহাই দিয়ে তো এগুলো হবে না। তাহলে তো প্রতিনিয়ত গজব পড়তে হবে, তাই না!

সৃজনশীল মানস গঠন ও মানুষের সৃজনশীলতা গড়তে পাঠাগার ভীষণ জরুরি। এভরি ম্যান হ্যাস আ গ্রেট পটেনশিয়ালিটি। প্রতিটা মানুষের কিন্তু একটা স্পেস লাগে। মানুষের সৃজনশীল হওয়ার জন্য অনেকগুলো বিষয় দরকার। আপনাকে যদি দিনভর খাদ্য সংস্থানে,

বেঁচে থাকার সংস্থানেই চলে যায়; তাহলে আপনি কীভাবে সৃজনশীলতার চর্চা করবেন। আপনাকে বেড়াতে হবে, ঘুরতে হবে, তার জন্য পরিবেশ লাগবে। প্রকৃতির সঙ্গে আপনি যদি নদী না দেখেন, নদী নিয়ে লিখবেন কীভাবে। আপনি যদি পাখি না দেখেন, পাখি নিয়ে কী লিখবেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছি। আমি যে-পরিবেশ দেখেছি জেলা শহর থেকে, এই প্রজন্ম তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ পাচ্ছে না। আমার বাবা-দাদা যেটা পেয়েছে, যেমনটা তাদের কাছে শুনেছি–নৌকা নিয়ে নদী থেকে নৌকা বোঝাই করে মাছ মেরে এনেছে। আমরা এমনভাবে না মারলেও বড়শি দিয়ে মাছ ধরেছি। এটা এখন রূপকথার মতো! এই যে জুঁই, জবা, কামিনী, কেয়া–এই ফুলগুলোর নাম আমরা এখন আর জানিও না! বাড়ি বলতে কিছু লেখা নাই, একটা উঠান, ছোটো একটা বাগান এইসব জিনিস কনসেপ্ট আছে। তাহলে যিনি সৃজনশীল মানুষ হবেন, তাঁর জন্য তো পাঠাগারটা আবশ্যক। এটা তো ভাত কাপড়ের মতোই দরকার। আমরা তো আসলে বড় একটা ভুল পথে পরিচালিত। কারণ আমাদের শিখানোই হয় পরিবার থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে–বড় হওয়া মানে অনেক টাকার মালিক হওয়া, পুঁজির সঞ্চায়ন করা। কিন্তু আমাদের সমাজ-পরিবেশ শিখিয়েছে–ভেদহীন মানুষ হও, সৎ, সংবেদনশীল মানুষ হও, কমিটমেন্টাল মানুষ হও। এইসব জিনিসগুলো যে আমরা শিখিনি, তাহলে আমরা যা শিখেছি, তার গোড়ায় গণ্ডগোল। একটা মানুষ মনোজগতে যে যাপন করবে, সে সুযোগ তো সমাজে নেই। এই ক্রিয়েটিভিটির স্পেসটা সমাজে নেই। এই স্পেসটার জন্যই পাঠাগারের মতো বিষয়গুলো জরুরি। কাগজে যেভাবে লিখি বা মুখে যেভাবে বলি–ভেদহীন সমাজ, মানবিক সমাজ, প্রাকৃতিক সমাজ, অগ্রায়নের সমাজ, সমতার সমাজ–তার জন্যেই কিন্তু পাঠাগার আন্দোলনটা দরকার।

লাবণী মণ্ডল: আপনি একটি সৃজনশীল প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। একইসঙ্গে চিন্তাশীল লেখালেখি ও গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। প্রকাশনার সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্কের বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

খান মাহবুব: প্রকাশনার সঙ্গে তো পাঠাগার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশক হিসেবে যদি বলি–ভালো বইয়ের জন্য ভালো পাণ্ডুলিপি লাগে। আর ভালো পাণ্ডুলিপি হওয়ার জন্য ভালো চিন্তা লাগবে, ভালো চিন্তার খোরাক লাগবে, ভালো পঠন লাগবে। মননশীলতার পূর্বসূত্র পঠন। ভালো চিন্তা করার জন্য যে আপনার মানসিক পটভূমি দরকার, তার জন্য কিন্তু পাঠাগার আবশ্যক।

লাবণী মণ্ডল: মানুষ পাঠবিমুখ হচ্ছে, শুধু ছুটছে মানুষজন। এ থেকে মুক্তি কীভাবে মিলবে?

খান মাহবুব: ছোটোবেলায় আমাদের শেখানো হয় অমুকে দেখ কত বড় হয়েছে, কত বড় গাড়ি কিনেছে। এই যে মানুষজন বাচ্চার কাঁধে এতগুলো বই ঝুলিয়ে দিয়েছে, এত বইয়ের দরকার নেই তো। অন্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা কিন্তু মানুষকে এক ধরনের খারাপের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। তাকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সেটা কিন্তু অসম একটা প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ তাকে তো জীবনযাপন করার সুযোগ দিচ্ছি না। শুধু চাওয়াগুলো প্রতিনিয়ত জ্যামিতিক হারে বাড়ছে মানুষের। ধরুন, একজন মানুষের একটা বাড়ি, একটা

গাড়ি, দশ কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স, প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা আয় তার কেন দরকার। তাতেও কি স্বস্তি মিলবে? সমাজ কিন্তু তাকে থামতে দিচ্ছে না, প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলছে। সে প্রতিযোগিতা হলো অসম, অনৈতিক প্রতিযোগিতা, বিবেকবর্জিত প্রতিযোগিতা। যেমন–ইউরোপীয় শহরে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলেই এক সঙ্গে পাঁচটা বাড়ি বানাতে পারবেন না, আবার বেশি আয় করলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে।

আমাদের সামাজিক-রেনেসাঁস দরকার। তার জন্য গোটা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। মানুষের চাওয়া, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবকিছুর মৌলিক পরিবর্তন দরকার। সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। তবে পরিবর্তন আসবেই। তবে আপাতত তেমন কোনো আশার আলো দেখছি না।

লাবণী মণ্ডল: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক মেগা প্রজেক্ট চলছে। সেইসঙ্গে আবার মসজিদ, মন্দির, গির্জা নির্মাণের টাকা রাষ্ট্রীয়ভাবে দেওয়া হয়। করোনাকালে পাঠাগার ও প্রকাশনা খাত ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো অনুদান দেখা যায়নি...

খান মাহবুব: আপনি সুন্দর, যৌক্তিক একটা কথা বললেন। রাষ্ট্র কোথায় অগ্রাধিকার দিবে, কোথায় বাজেটের বরাদ্দ বেশি, সেটা দেখলেও বোঝা যায়–আমরা কোনদিকে যাচ্ছি। এখানে কোনো মন্ত্রী বা এমপির কাছে গিয়ে বলবেন, একটা পাঠাগার করতে চাই, বা একটা এলাকাভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে বই করতে চাই–সেটিতে কিন্তু আগ্রহী হবে না। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি একটা রাস্তা করতে চাই, ড্রেন করতে চাই; তাহলে দেখবেন যে, তারা টাকা ঢালবে, উদ্বোধন করবে; নিজের নামে ফলক তৈরি করবে। একটা হাস্যকর বিষয় যে গ্রামে একটা কালভার্ট তৈরি করতেও তিন-চার কোটি টাকা লাগে। আমি অনেকবার জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ছিলাম, অনেক ধরনের একাডেমিক বাজেট মিলে পাঁচ কোটি টাকা! এখানে তো পাঁচশ কোটি হওয়া দরকার। বেসরকারি লাইব্রেরিগুলোর জন্য তো সরকারি তেমন কোনো অনুদানই নেই। যা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়, তা খুব হাস্যকর! একটা তৃতীয় ক্যাটাগরির লাইব্রেরির অনুদান পঞ্চাশ হাজার টাকা। প্রথম ক্যাটাগরি হলে ৬০-৭০ হাজার টাকা।

বেশিরভাগ পাঠাগারে কিন্তু সরকারি কোনো অনুদান নেই। বাংলাদেশে তিন হাজার লাইব্রেরির মধ্যে দেড় হাজার লাইব্রেরিতে বছরে তিন লক্ষ টাকা দিতে পারে। বাংলাদেশে ৫৭-৫৮টা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু এর তেমন কোনো কাঠামো দাঁড়ায়নি। না আছে পড়ানোর যোগ্যতা, না আছে কোনো স্ট্রাকচার, না আছে ছাত্র!

লাইব্রেরি নিয়ে গভর্মেন্টের সুন্দর সুন্দর কথা আছে; কিন্তু মূল যে প্রভাবক ফান্ড–সেটি কিন্তু খুবই কম। এদিকে নজর দিতে হবে। শিল্পকলা, নাচ-গানের জন্য যে অনুদান রয়েছে, লাইব্রেরি জন্য তার কিছুই নেই। যে কারণে এত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করেও বাংলাদেশে কেউ পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস পায় না। এটা তো

আলটিমেটলি রাষ্ট্রেরই দায়।

লাবণী মণ্ডল: আপনি জেলা শহরের মানুষ। এইচএসসি পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। সে সময়ে কি পাঠাগার ছিল কিংবা নিয়মিত যাওয়া হতো; সে স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইছি।
খান মাহবুব: আমাদের পরিবার খুব কালচারাল ছিল। আমিও সেই পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি। ক্লাস থ্রি-ফোর থেকে কালচারাল সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এইচএসসিতে পড়া অবস্থায় শিক্ষা সপ্তাহে থানা-জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছি, গোল্ড মেডেল পেয়েছি। আমাদের কিন্তু উপশহরে বাসা। জেলা শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে।

আমাদের পাঠাগারটির নাম ছিল রমেশ হল। আমাদের কেন্দ্রই ছিল ওই পাঠাগার। আবৃত্তিচর্চা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এসবের মধ্যেই বেড়ে ওঠা। বৃহস্পতিবার বিন্দুবাসিনী সরকারি স্কুলের লাইব্রেরি খুলে দিত। হুড়হুড় করে ঢুকে পড়তাম। সে অন্যরকম আনন্দানুভূতি।
স্কুল থেকে মুকুলিকা বের হতো। শশধর সাহা স্যার ওই কাজে লিড দিতেন। আমাদের সে কী উৎসাহ! একটা কবিতা প্রকাশের জন্য স্যারের কাছে ম্যাও-ম্যাও করেছি। স্যার খুব রাগী ছিলেন। মাঝে-মধ্যে বলতেন, তোর কবিতা হয়নি। আবার কেটে-কুটে সুন্দর করে ছেপে দিত। স্কুলের ক্লাব ছিল নবারুণ, ত্রিশালয়। বিভিন্ন ক্লাবের মধ্য দিয়ে আন্তঃপ্রতিযোগিতা হতো। ক্লাস সেভেন-এইট থেকেই কিন্তু বাঙালির বেদিমূলের বই শরৎ-বিভূতি-মানিদের বই পড়ে ফেলেছি। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে অনেক সুহৃদের ব্যবহার করতাম, যাতে একটু বেশি সময় থাকতে দেয়।
টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারে যেতাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়তাম। তাতে অন্যরকম আনন্দ ছিল। মানুষের ভিড় লেগে থাকত। সিনিয়ররা সব দখল করে থাকলেও, আমরা কয়েকজন যেতাম। চিত্রালী, পূর্বাণী এগুলোর প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। থরে থরে বই ছাপানো, দেখতেও তো ভালো লাগত। এখন সে অনুভূতি কাজ করে কি না।

এখনকার শিশুদের ঘাড়ে এত ব্যাগের বোঝা, ওরা কখন অন্য বিষয়ে ভাববে! আমাদের শৈশব কেটেছে মাঠে। আমার বন্ধু-বান্ধবরা নিয়মিত খেলত, আমরা দুয়েকজন যেতাম। একটা মানুষ বিকালে মাঠে না গিয়ে বাঁচে সেইটা তো চিন্তা করতে পারিনি। আট থেকে নয় ফুট একটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানুষের জীবন কাটে কীভাবে! হাত-পা ছিল শক্ত, খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কেটে রক্ত বের হয়ে যেত, কোনো ব্যাপার না।

লাবণী মণ্ডল: দেশে বেশ কিছু বিশেষায়িত গ্রন্থাগার থাকলেও, গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা গুটিকয়েক। যেমন–রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, অথচ এখানে গণগ্রন্থাগার মাত্র একটি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কেমন উদ্যোগ থাকা দরকার?
খান মাহবুব: পাঠাগার-গ্রন্থাগার থাকলেও গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা গুটিকয়েক। তা ছাড়াও স্পেশাল লাইব্রেরি আছে। চিকিৎসার মান যাই হোক না কেন ঢাকা শহরে কিন্তু সরকারি

হাসপাতাল রয়েছে। শরীরের চিকিৎসার জন্য তা থাকলেও, মনের চিকিৎসার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। পাঠাগার বিষয়টি তো একেবারেই নগণ্য। সরকার চাইলে উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা শহরে বিশটা পাঠাগার করতে পারে; কিন্তু লাইব্রেরি না করলে তো ভোটের রাজনীতি পিছিয়ে যাবে না, সরকারের রাজনীতি পেছায় ড্রেন, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ আটকে গেলে!

লাবণী মণ্ডল: ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক পাঠাগার গড়ে উঠছে। সেগুলো টিকিয়ে রাখা অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনাগুলো কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

খান মাহবুব: পাঠাগার সময় ও মানুষের তাগিদেই গড়ে ওঠে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কেউ এটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে, কেউ নেয়নি। এইসব কারণে পাঠাগারগুলো কিন্তু অনেক অপূর্ণাঙ্গতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। কোনো মানুষের কিছু টাকা আছে, তিনি ভাবলেন–একটি পাঠাগার হয়তো গড়ে তোলা যায়। অনেকে আবার খুব সিস্টেমেটিক লাইব্রেরি করেছে, গুছিয়ে করেছে। কিন্তু আর্থিক বুনিয়াদ ছাড়া প্রতিষ্ঠান চালিয়ে নেওয়া মুশকিল। একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর চেয়ে, চালিয়ে নেওয়া কঠিন। ইমোশন দিয়ে একটা জিনিস গড়ে তোলা যায়, কিন্তু দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে হলে তো পুঁজির দরকার। এটাই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য সমস্যা।

অথচ পাঠাগার কিন্তু একটা ইউনিক জায়গা হতে পারে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সবার যাওয়ার সুযোগ নেই। পাঠাগার কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত। এই যে আমাদের পরিবারের সমস্যা, তার মূল কারণ হলো আমাদের বিচ্ছিন্নতা–এটি নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। বই এমন একটা জায়গা, যেখানে নিজের দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষ বের হতে পারে। সমাজের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

প্রকাশকরা অনেকভাবেই পাঠাগারে সহযোগিতা করতে পারেন। পাঠাগারগুলোতে আমরা আর্থিকভাবে কিছু সহযোগিতা করতে পারি। তবে আর্থিকভাবে খুব বেশি সহযোগিতা করা প্রকাশকদের জন্য সবসময় সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের অনেক বই কিন্তু গুদামঘরে পড়ে আছে। তার একাংশ আমরা পাঠাগারগুলোতে দিতে পারি। আমি মনে করি, আমার অন্য ব্যবসার চেয়ে প্রকাশনায় যদি বেশি লাভ করতে চাইতাম, তাহলে অন্য ব্যবসায় যেতে হতো, তাহলে ফাস্টফুডের দোকান করতাম।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামীণ সমাজে যেখানে শিক্ষার সুযোগ অনেক কম, সেখানে পাঠাগার সামাজিক পরিবর্তনে কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

খান মাহবুব: শহরে কাঠামোবদ্ধ পড়াশোনার সুযোগ বেশি, গ্রামীণ সমাজে তা অনেকাংশেই কম। দেখা গেল, পরিবার শিক্ষার ভূমিকাটা বুঝছে না, ১০-১৫ বছর হয়ে গেলেই কৃষিকাজে যুক্ত করেন। সে ক্ষেত্রে পাঠাগার থাকলে কিন্তু একটা বড় সুবিধা হয়। এটা কিন্তু একটা সেকেন্ড এডুকেশন সেন্টার। অর্থাৎ এখানে শুধু স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাই নয়; যারা স্কুল-কলেজের থেকে ড্রপআউট হয়ে গেছে, তারাও পড়তে পারে, যেতে পারে, আনন্দ ভাগাভাগি

করতে পারে। হয়তো সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এগিয়ে নিতে পারবে না; কিন্তু তার মনোভুবনটা গড়ে উঠতে পারে পাঠাগারের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু পাঠাগার ভূমিকা রাখতে পারবে। শুধু তা-ই নয়, অনেকেই কর্মে ঢুকে গেছেন, পড়াশোনা শেষ করেননি; পাঠাগার থাকলে কিন্তু অবসরে পত্রিকা পড়বে, আড্ডা দিবে, সংযোগ বাড়বে।

অনেকেই মনে করেন হুমায়ূন আহমেদ কিংবা ইমদাদুল হক মিলনের সাহিত্য পড়ে কোনো লাভ হবে না–এগুলো স্থূল সাহিত্য। ঠিক আছে, তাদের সাহিত্য হয়তো অনেক কিছু বানাবে না, কিন্তু পড়ার অভ্যাস তৈরি করবে। গ্রাম-মফস্বলের অনেক মানুষ কিন্তু এ সাহিত্য পড়েই অভ্যাস তৈরি করতে পেরেছে। আরেকটা বিষয় হলো–আজ যে হুমায়ূন আহমেদ পড়বে, তার বোধ কিন্তু আরও শাণিত হবে, এর পর সে কিন্তু হুমায়ুন আজাদ-আহমদ ছফাও পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে আশা জাগানিয়া ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ সমাজে এখনও একটা বড় বিষয় রয়ে গেছে। আমাদের নগরসমাজে মানুষ খুব ব্যস্ত থাকে, ছুটে চলে শুধু; কিন্তু গ্রামীণসমাজে এত ব্যস্ততা নেই। কৃষিশ্রমিকদের কাজশেষে অবসর থাকে, দোকানে আড্ডা দেয়; রাজনীতিক আড্ডা দেয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এতে থাকে। পাঠাগার থাকলে কিন্তু সবাই পাঠাগারমুখী হবে–সেই চেষ্টাটুকু করা জরুরি। এটা করলেই রুচির পরিবর্তন আসবে। তাহলেই বড় লাভটুকু আসবে, মানুষ বইমুখী হবে। বিশ্বের অনেক দেশে সেটি রয়েছে। সেখানে আরাম-আয়েশে বই পড়া যায়, গল্প-আড্ডায় মশগুল থাকা যায়। এখানে সে পরিবেশ দিতে পারলে, মানুষের চিন্তা-চেতনার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। পাঠাগারগুলোর সংখ্যা বাড়াতে হবে, বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রামে পাঠাগার গড়ে তুলতে হলে, কৃষি বিষয়ক বইটা জরুরি। তা হলে গ্রামের লোকজন নিজের প্রয়োজনেই আসবে। যে গ্রামের যেমন প্রয়োজন, তেমন বই রাখলে কৃষকরা উপকৃত হবে। কৃষি উপকৃত হবে। এভাবে ভাবতে হবে। এজন্য আমাদের গ্রামীণ সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। দিনকে দিন সমাজ গহীন অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, পাঠাগার এর থেকে মুক্তি মেলাতে পারে।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামে পাঠাগারগুলোতে পাঠকদের বেশির ভাগই শিশু-কিশোর। কিন্তু তাদের মানস গঠনের উপযোগী বই অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ভাবনা বা উদ্যোগ রয়েছে কি?

খান মাহবুব: শিশুদের জন্য যে ধরনের বই দরকার, সে ধরনের বইটা আসলে নেই। শিশুতোষ বই আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম দরকার, তেমন অবকাঠামোও নেই। আমরা বলি যে, কিছু বই আছে–যার মানে আমরা নির্দিষ্ট কিছু বই পড়েছি। আমি খুব বেশি দূরে যাব না, প্রতিবেশী মালয়েশিয়ার কথা বলব। শিশুরা সবসময় রকমারি এবং বৈচিত্র্যময় বিষয় পছন্দ করে। শিশুদের আমরা খেলনা দেই কেন? আমি-আপনি বইয়ের প্রতি যেভাবে আকর্ষণবোধ করতে পারি। শিশুর জন্য যে বই এবং পরিবেশ দরকার, কোনোটাই কিন্তু আমাদের নেই। এ কাজে এক নম্বরেই থাকবে লাইব্রেরি। মালয়েশিয়ায় দেখা যাবে পাঠাগারে শিশুরা খেলছে, চারদিকে দেখছে, মানে এটা হলো দশজনের একটা সিনেমা। এটা যেন এক আনন্দঘর। খেলনা থেকে শুরু করে এর মধ্যে

ভিজুয়াল দেখবে; এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শুরু করে অনেককিছুই থাকবে। বই দেখে কতক্ষণ পড়বে আর শুনবে; আর যদি টিভিটা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এগুলোই দেখবে। আমাদের এই বইগুলোর জন্য পাঠাগারে আলাদা করে শিশু কর্নার নেই। পাঠাগারের ভেতরের পরিবেশও শিশুদের মতোই হতে হবে। চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে সবখানে একটা রঙের ছোঁয়া থাকতে হবে। ছয়-সাত বছরের বাচ্চা শিশুরা খেলবে-লাফাবে সে পরিবেশটা তাদের হবে।

লাবণী মণ্ডল: প্রতিটি গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। গত ১৬ বছর ধরে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্যোগকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
খান মাহবুব: এ ধরনের কাজে একটা বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার–কাজটা কে করল না করল, সেটা দেখার বিষয় না। গ্রাম পাঠাগার এ রকম একটা আলোর বাতিঘর। যে বিচ্ছুরণ করার জন্য চেষ্টা করছে। এ রকম হাজারো গ্রাম পাঠাগার হতে হবে, বিভিন্ন নামে হোক। বিভিন্ন ধরনের হবে। আবার এর মধ্যে একটা মূল লক্ষ্যের মধ্যে সবার একটা ঐক্য দরকার। সেটাকে ঘিরে 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন' সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়া দরকার। আমরা যারা সমাজে এমন উদ্যোগের পাশে আছি, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দরকার। এটিকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

আমি ধরে নিচ্ছি গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন হামাগুড়ি দিচ্ছে। যেসব মানুষ সামাজিক ভিত্তিতে তার হাত ধরতে পারে, তাদের এর সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। শক্ত একটা হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের শিরদাঁড়া সোজা করা যায়। এই সামাজিক আন্দোলনটা ব্যক্তিগত কয়েকজনের নয়। এটা তো মূল ধারার আন্দোলন। যখন সামাজিক পর্যায়ে কাজ হবে, সেই কাজটা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়েও প্রভাব ফেলবে।

আমরা দূরে থেকে বাহবা দিলে হবে না, আমাদের যে যতটা পারি, সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজে হাত বাড়াতে হবে। পাঠাগার আন্দোলন অনেক রকমের হতে পারে। প্রত্যেকটারই মূল উদ্দেশ্য হলো–পাঠাগার আন্দোলনটা সচল করা, জাগ্রত করা, এইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে ফর্মটি ছড়ানো হোক না কেন সেটাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে একটা আন্তঃসংযোগ যেন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একেকটা প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু মূল লক্ষ্য একটাই। নৌকা বাইচে বৈঠা কিন্তু সবাই চালায়, পেছনের নিশান ধরে একজন বসে থাকে, সে কিন্তু নৌকাটা একটা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। সেরকম হালটা ধরে সবার যে শক্তিটা, সেইটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সেরকমভাবে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন সবার সঙ্গে সবাইকে সংযুক্ত করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে। সব শেষে বলব, সমাজ এ রকম থাকবে না–সমাজ পরিবর্তন হবে, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। বিপ্লব যে হবে না, সে তো আর দিব্যি কেটে বলতে পারি না।